দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 0·8·DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

অর্থনীতির আলোকে —

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

মোঃ ওয়ালি উল ইসলাম

বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে '৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে দেশের কিছু কিছু এলাকায় "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী" নামে একটি প্রকল্প সরকারী এবং বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অর্থায়নে চালু রয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশব্যাপী পরিচালিত নয়। চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট থানাগুলো এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫ থেকে ১১ বছর বয়সের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিতে অনুপ্রাণিত ও স্থায়ীভাবে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে– প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার বিনিময়ে ছাত্রদের দরিদ্র পিতা-মাতা প্রতি মাসে তাদের প্রতি সন্তানের জন্য ১৫ কেজি করে সর্বাধিক দুই সন্তানের জন্য ৩০ কেজি খাদ্যশস্য বিনামূল্যে পায়। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া আশির দশকের শেষ দিকে আইন প্রণয়ন করে সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও দেখা গেল, বাংলাদেশের অনেক নাগরিক বিশেষ করে দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণের জন্য আগ্রহী নয়। এমনকি কিছু কিছু পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে ভর্তি করলেও অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তারা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে ফলে তাদের সন্তানরা অতি অল্প দিনের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করে চলে আসছে। মূলত এই অবস্থার উন্নতিকল্পেই দরিদ্র পিতা-মাতাকে প্রলুব্ধ করে তাদের সন্তানদের প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণের জন্য আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বেশ কয়েক বছর ধরে সীমিত আকারে চলছে।

এই প্রকল্পে সরকারের বিনিয়োগ কতটা যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কারণ এ প্রকল্পে ডেলিভারি সিস্টেমে (মূল উপকরণের বিতরণ ব্যবস্থায়) নানান রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ডেলিভারি সিসটেমের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে যে কোন মহৎ উদ্যোগের সফলতা লাভ করা প্রায় দুঃসাধ্য। তবে আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর পর থেকে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ছাত্রদের স্কুল ত্যাগের প্রবণতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যে কারণে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সফলতার হারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায়। তবু অনেকের ধারণা, এই প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয়, এই প্রকল্প গ্রহণের পিছনে 'শিক্ষা-অর্থনীতি'র যে তাত্ত্বিক বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত সে বিষয়টি তেমন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়নি এবং এখনও হচ্ছে না। তাই এই নিবন্ধে 'শিক্ষা অর্থনীতি'র তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোকে প্রকল্পটি পরিচালনার যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রথমেই 'শিক্ষা অর্থনীতি'র কথা বলে হয়ত একটা বিতর্কের সৃষ্টি করলাম। শিক্ষা অর্থনীতিকে সাধারণ অর্থনীতির থেকে আলাদা করে দেখতে অনেক অর্থনীতিবিদই রাজি হবেন না। কারণ ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও শিক্ষা অর্থনীতি বিষয়টি তেমনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখনও Expenditure on Education was considered as cousumption. ষাটের দশকের শেষ ভাগে এসে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেল Expenditure on Education is a good investmentÇ তখন থেকেই পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ দেশগুলোতে শিক্ষা অর্থনীতিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হতে থাকে। কারণ সাধারণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের বিপরীতে Return-এর বহুলাংশই প্রত্যক্ষ কিন্তু শিক্ষা অর্থনীতির বিনিয়োগের বিপরীতে Return-এর বহুলাংশই অ-প্রত্যক্ষ এবং যার হিসাব-নিকাশ করাও খুবই জটিল। তাই সাধারণ অর্থনীতি থেকে শিক্ষা অর্থনীতিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করাকে অনেকে সমীচীন মনে করেন। সেই শিক্ষা অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে– শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক, প্রকৌশল, মেডিক্যাল, স্নাতকোত্তর ইত্যাদি) মূল্য নির্ধারণ (Unit cost of Education) করা। শিক্ষা মূল্য নির্ধারণের সময় যে তিনটি Factor প্রধানত বিবেচনা করা হয়– তা হচ্ছে (১) Institutional cost (প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়)

(চলবে)

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অপর্চুনিটি কষ্ট কি তারা জানে না, পড়তে পারার আনন্দে তারা বিভোর —মীর আহাম্মদ মীরু